জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

বুলেটিন নং ২১, ৪র্থ বর্ষ, ১১ই জুলাই ১৯৯৫ ইং মঙ্গলবার

THE JUMMA SAMBAD BULLETIN

Newsletter of the Parbattya Chattagram Janasamhati Samiti

Issue No.—21, 4th year, 11th July, 1995. Tuesday

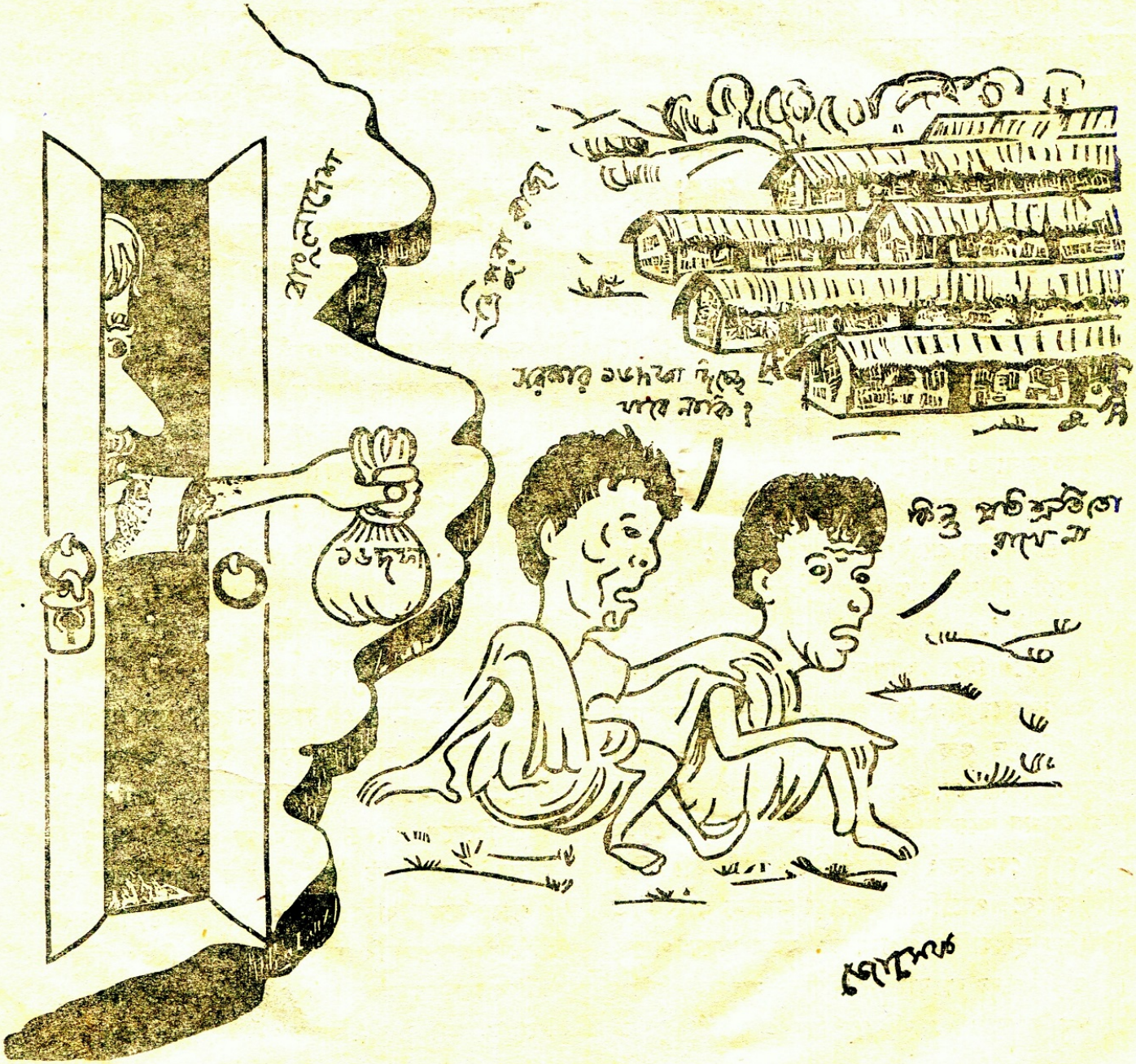

সম্পাদকীয়

ভারতের ত্রিপুরা থেকে প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের যথাযথ পুনর্বাসন ও প্রতিশ্রুত গুচ্ছ প্রস্তাব বাস্তবায়নে সরকারের অসদিচ্ছা ও অপারগতার কারণে শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বর্তমানে সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। এতে অপ্রত্যাবাসিত জুম্ম শরণার্থীদের ভবিষ্যৎ যেমন অনিশ্চিৎ হয়ে পড়েছে, তেমতি প্রত্যাগতদের জীবনেও হতাশা ও সন্দেহ প্রবণতা দেখা দিয়েছে। সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের ক্ষেত্রেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে।

একটা বিষয়ে অবশ্য সকলে একমত যে, শরণার্থী সমস্যাটি মূলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা থেকে উদ্ভূত। তাই মূল সমস্যার সমাধান ব্যতীত এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। যেমন মূল সমস্যার সমাধান না হওয়ার কারণে ১৯৭৮ ও ১৯৮১ সালে ত্রিপুরা থেকে ও ১৯৮৬ সালের মিজোরাম থেকে প্রত্যাবর্তন করে ও ১৯৮৬ ও ১৯৮৯ সালে বর্তমান শরণার্থীদের আবার ত্রিপুরাতে আশ্রয় নিতে হয়েছে। কিন্তু বড়ই রহস্যজনক যে, এই বাস্তবতা সত্বেও বাংলাদেশ সরকার কেবল জুম্ম শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের উপর জোর দিয়ে আসছে।

সুদীর্ঘ ও নিরলস প্রচেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত ১৬ দফা গুচ্ছ প্রস্তাবের ভিত্তিতে জুম্ম শরণার্থীরা প্রত্যাবাসনে সম্মত হলে গত আগষ্ট '৯৪ ইং পর্যন্ত দুই দফায় ৫,১৬৯জন জুম্ম শরণার্থী স্বদেশে ফিরে আসেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের সবচেয়ে উচিৎ ছিল প্রত্যাগতদের স্থায়ী পুনর্বাসন করা ও প্রতিশ্রুত গুচ্ছ প্রস্তাবের পূর্ণ বাস্তবায়ন করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, প্রত্যাগতরা সুষ্ঠ পুনর্বাসন পায়নি তাদের বেদখল হয়ে যাওয়া জমি ও বাস্তুভিটা ফেরৎ পায়নি, কেহ কেহ ফেরৎ পেলেও নিরাপত্তাহীনতায় নিজ বাস্তুভিটায় যেতে পারেনি। তাছাড়া অন্যান্য আর্থিক ও সাংবিধানিক সুবিধাদিও প্রত্যাগতরা যথাযথভাবে পাচ্ছে না। তাই তাদের বারবার সাংবাদিক সম্মেলন, মিছিল করতে দেখা যাচ্ছে। এমনকি পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় জড়িত প্রত্যাগত সদস্যরাও পদত্যাগ করছে।

অন্যদিকে ত্রিপুরায় অবস্থানরত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দও এযাবৎ প্রত্যাগতদের অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্য দুবার পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করে গেছেন। তাঁরা তাদের সফরের রিপোর্টে প্রত্যাগতদের ভূমি ও বাস্তুভিটা ফেরৎ না দেয়া, আর্থিক ও পেশাগত সুবিধাদি প্রদান না করা সহ প্রত্যাগতদের জীবন ও নিরাপত্তা হীনতার প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তাঁরা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার এই অবস্থার জন্য বাংলাদেশ সরকারের অসদিচ্ছা ও জুম্ম উচ্ছেদ নীতিকে দায়ী করেছেন।

জুম্ম শরণার্থী নেতৃবৃন্দের এইসব অভিযোগের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যে অবস্থায় এইসব জুম্ম নরনারীকে ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছে, সেই অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। যেহেতু তাদের ভূমি বেদখলকারী অনুপ্রবেশকারীদের ও সেনা ক্যাম্পগুলি নিরাপদমূলক দূরত্বে সরানো হয়নি। জনসংহতি সমিতি ও সরকারের যুদ্ধবিরতি ও সংলাপ অব্যাহত থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান এখনো সুদূর পরাহত। এই যুদ্ধবিরতি ও সংলাপ প্রক্রিয়া ভেঙ্গে গেলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি আবার ১৯৮৬ সালের অবস্থায় যেতে পারে। তাই প্রত্যাগত ও আপামর জুম্ম জনগণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে এবং সরকার আরো যুদ্ধংদেহী কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের এই বাস্তব অবস্থায় জুম্ম শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের অস্বীকৃতি তাই খুবই অপ্রত্যাশিত ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কিন্তু সমগ্র জুম্ম জনগণ চায় শরণার্থীরা আর বিদেশে উদ্বাস্তু জীবন না কাটিয়ে দেশে ফিরে আসুক। জনসংহতি সমিতিও জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে বাস্তাবায়ন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে বিগত দুই বৎসরের অধিক যুদ্ধবিরতি ও সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। তাই বাংলাদেশ সরকারের উচিত এক্ষেত্রে আরো বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

জুম্ম শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের অচলাবস্থা

শ্রী জগদীশ

ভারতের ত্রিপুরাতে আশ্রিত জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে আবার অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এ বছরের শুরুতে ফেব্রুয়ারীতে যোগাযোগ মন্ত্রি কর্ণেল (অবঃ) অলি আহম্মদের ত্রিপুরার শরণার্থী শিবির সফর ও মার্চ মাসে জুম্ম শরণার্থী নেতৃবৃন্দের পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরেও এই অচলাবস্থা দূর হয়নি। অথচ এই দুটো উদ্যোগ সফল হলে এতদিনে আরো কয়েক হাজার জুম্ম শরণার্থী দেশে ফিরে আসতো। এমনকি চলতি বর্ষার আগে সকলের প্রত্যাবর্তন সম্ভব হতো।

জুম্ম শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের এই অচলাবস্থার জন্য উভয় পক্ষের ভিন্ন ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। বিগত মার্চের সফর সহ মোট তিনবার জুম্ম শরণার্থী প্রতিনিধিরা পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরে আসেন। কিন্তু সফরকারী প্রতিনিধিরা প্রতিবারে হতাশ হয়ে শিবিরে ফিরে যেতে বাধ্য হন। তারা প্রতিবারে প্রতিশ্রুত গুচ্ছ প্রস্তাব বাস্তবায়নে সরকারের অসদিচ্ছা ও অপারগতার কথা বলেছেন। তাদের অভিযোগের মধ্যে বিশেষতঃ বেদখলকৃত ভূমি ফেরৎদানের বিষয়টি প্রধান ছিল। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, মানবাধিকার লংঘন ও অনুপ্রবেশের অভিযোগও রয়েছে। অপরপক্ষে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিস্থিতি ও প্রতিশ্রুত সকল গুচ্ছ প্রস্তাব বাস্তবায়নের দাবী করে আসছে। এই দাবী কিন্তু বাংলাদেশ সরকার আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক গুরুত্ব সহকারে প্রচার করে আসছে। বিশেষ করে জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের যুদ্ধবিরতিকে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক বলে দাবী করছে। আর কতিপয় প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীকে ভূমি ফেরৎ দিয়ে ভূমি সমস্যা সমাধানের সাফাই গেয়ে চলেছে।

উভয়পক্ষের এই পরস্পর বিরোধী বক্তব্যে কিন্তু জুম্ম শরণার্থী সমস্যার সমাধান হয়নি এবং সমস্যাটি অধিকতর জটিল হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ার অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ সরকারের অসদিচ্ছা ও প্রবঞ্চনামূলক মনোভাবের ফলে এই সমস্যা বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে। লক্ষ্যনীয় বিষয় যে, এই সমস্যার প্রথম থেকে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে এসেছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক জনমতকে প্রশমিত করতে এসব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এটা স্পষ্ট যে, এই সব উদ্যোগ কিন্তু সমস্যার প্রকৃত ও দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের জন্য নয়, নিতান্ত সাময়িক ও প্রশান্তিমূলক ছিল। যেমন— জুম্ম শরণার্থীদের ভারতের আশ্রয়লাভের প্রথম ৮ মাসে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারীতে প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ। কিন্তু যে মুহূর্তে সকল প্রকার অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে বাঁচানোর জন্য শরণার্থীরা আশ্রয় নিচ্ছিল, পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চল যখন সম্পূর্ণ রণাঙ্গনে পরিণত হয়েছিল, তখন কি এই জীবন-বিপন্ন শরণার্থীদের দেশে ফেরা সম্ভব ছিল? তাই জুম্ম শরণার্থীদের দেশে ফেরার অসম্মতি ও প্রবল আন্তর্জাতিক চাপের মুখে বাংলাদেশ সরকারের এই উদ্যোগ বানচাল হয়ে যায়। এরপর বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময়ে ত্রিপুরায় প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব উদ্যোগ ছিল সম্পূর্ণ লোকদেখানো। যেহেতু এসব প্রতিনিধিরা জুম্ম শরণার্থীদের

বারবার দেয়া কোন স্মারকলিপি পর্যন্ত গ্রহণ করেননি এবং শরণার্থীদের ন্যূনতম দাবী পরিপূরণের ক্ষমতা তাদের ছিল না। এসব প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে বর্তমান ক্ষমতাসীন বি এন পি সরকার ক্ষমতায় এসে আবার পূর্বতন সরকারের ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। ফলে জুম্ম শরণার্থীদের দাবী-দাওয়াকে উপেক্ষা করে বাংলাদেশ সরকার আবার ৮ই জুন, ১৯৯৩ ইং তারিখে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের জন্য ভারত সরকারের সাথে চুক্তি করে। শেষ পর্যন্ত জুম্ম শরণার্থীরা দেশে প্রত্যাবর্তনের অস্বীকৃতি জানালে এই উদ্যোগও ব্যর্থ হয়ে যায়।

বাংলাদেশ সরকারের এইসব উদ্যোগ ছিল বস্তুতঃ সম্পূর্ণ প্রবঞ্চনামূলক। যেহেতু এই সময়ে জুম্ম শরণার্থীদের দেশে প্রত্যাবর্তনের মত পরিস্থিতি পার্বত্য চট্টগ্রামে ছিল না। অনুপ্রবেশকারীদের ভূমি বেদখল, জুম্ম জনগণের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন, ধর্ষণ, লোগাং হত্যাকাণ্ড ও রাংগামাটিতে সাম্প্রদায়িক দাংগা এই সময়ে ঘটেছিল। তদুপরি এইসব উদ্যোগের সময় শরণার্থীদের দাবী-দাওয়াকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছিল। কিন্তু যারা দেশে ফিরবে তাদের ন্যূনতম দাবীকে উপেক্ষা করে কি সমস্যার সমাধান সম্ভব? তাই এইসব প্রবঞ্চনামূলক সব উদ্যোগই ব্যর্থ হয়ে যায় এবং আন্তর্জাতিক মতামতকে বিভ্রান্ত করতে ব্যর্থ হয় বাংলাদেশ সরকার।

অবশেষে বাংলাদেশ সরকার কিছুটা বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে জুম্ম শরণার্থীদের দাবী-দাওয়াকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। ১৬ দফা সম্বলিত এক গুচ্ছ প্রস্তাবের ভিত্তিতে জুম্ম শরণার্থীরা ১৫ই ফেব্রুয়ারী ৯৪ ইং হতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে রাজী হয়।

কিন্তু দুই পর্যায়ে মাত্র ৫১৬৯ জন শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের পর প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে যায়। জুম্ম শরণার্থী নেতৃবৃন্দ তৃতীয়বারের মত পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করে পরবর্তী প্রত্যাবাসনে অস্বীকৃতি জানায়। তাদের অভিযোগ বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্রুত ১৬দফা গুচ্ছ প্রস্তাব বাস্তবায়ন করছে না। ফলে প্রত্যাবর্তিত শরণার্থী পরিবার গুলি তাদের ভূমি ও বাস্তুভিটা ফেরৎ পায়নি। অনেক ফেরৎ পেলেও নিরাপত্তার অভাবে নিজ বাস্তুভিটায় ফিরে যেতে পারছে না ও নিজ জমিতে চাষাবাদ করতে সক্ষম হচ্ছে না। নিজ জমিতে কাজ করতে গিয়ে এভাবে প্রত্যাবর্তিত শ্রী চন্দ্র বিকাশ চাকমা বেদখলকারীর আক্রমণে গুরুতর-ভাবে আহত হয়েছেন। এছাড়া প্রত্যাবর্তিত সরকারী চাকুরেরা তাদের ন্যায্য ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি পাচ্ছেন না। কথা দেওয়া সত্বেও বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা হয়নি। কৃষকদের হালের বলদের টাকা প্রদানে নানা তালবাহানা ও জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রত্যাবর্তিতদের কেবলমাত্র ছয় মাসের রেশন দেয়া হচ্ছে। অথচ সরকারী উদ্যোগে পুনর্বাসিত মুসলমান বাঙ্গালীদের সুদীর্ঘ দেড় দশকের বেশী সময় ধরে সরকার রীতিমত রেশন দিয়ে ভরণ-পোষণ করে আসছে। আরো অভিযোগ যে, সরকার ঘোষিত সাধারণ ক্ষমা সত্বেও প্রত্যাবর্তিতদের পুলিশি হয়রানি করা হচ্ছে। জনৈক কালাধন চাকমাকে (ভাইবোনছড়া) এভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তদুপরি পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে আসেনি। প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ার কিছুদিন আগে সংঘটিত হয় নানিয়ারচর হত্যাকাণ্ড (১৭ই নভেম্বর, ১৯৯৩ইং)। আর অতি সম্প্রতি বান্দরবানে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের মিছিলে এক জঘন্য সাম্প্রদায়িক ও পুলিশি আক্রমণ চালানো হয়েছে। অন্যদিকে যুদ্ধবিরতির সুযোগে বাংলাদেশ সেনারা নূতন ক্যাম্প স্থাপন করে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করছে। অনেক ক্ষেত্রে সেনারা যুদ্ধ-বিরতি লংঘন করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে টহলদান ও শান্তিবাহিনী গ্রেপ্তার অব্যাহত রেখেছে। সরকারী সেনাদের এই যুদ্ধংদেহী মনোভাবে জুম্ম জনগণ আজ দিন দিন শংকিত হয়ে পড়ছেন। অথচ বাংলাদেশ সরকার এই যুদ্ধবিরতির দোহাই দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি বরাবর স্বাভাবিক বলে সাফাই গেছে চলেছে।

বিগত ফেব্রুয়ারীর ১ম সপ্তাহে যোগাযোগমন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) আলি আহম্মদ আবার ত্রিপুরায় শরণার্থী শিবিরগুলো সফর করে আসেন। এ সফরের সময় তাকুমবাড়ী শিবিরের শরণার্থীরা প্রতিশ্রুত ষোল দফা গুচ্ছ প্রস্তাব বাস্তবায়ন না করার জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। আরো দুঃখজনক যে, সফরের শেষ পর্যায়ে শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে তিনি সরাসরি আলোচনাও করেননি। অথচ তার কাছ থেকে শরণার্থী নেতৃবৃন্দ অনেক কিছু আশা করেছিলেন। এরপর পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করেও শরণার্থী নেতৃবৃন্দ সন্তুষ্ট হতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তবতার কারণে জুম্ম শরণার্থীরা দেশে প্রত্যাবর্তনে অস্বীকৃতি জানায়।

বলা বাহুল্য যে, দীর্ঘদিনের এই সমস্যাটি খুবই জটিল বটে। আর অদূর ভবিষ্যতে এই সমস্যাটি আরো জটিল হয়ে উঠার সম্ভাবনা অনেক বেশী। জনসংহতি সমিতি ও সরকারের মধ্যেকার চলিত যুদ্ধবিরতি ভেঙ্গে গেলে এই সমস্যার সমাধান আরো সুদূর পরাহত হয়ে উঠবে নিশ্চয়। মূলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে এই শরণার্থী সমস্যার প্রকৃত সমাধান সম্ভব। যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা হতে এই সমস্যাটি উদ্ভূত। এক্ষেত্রে শরণার্থী নেতৃবৃন্দের স্পষ্ট ধারণাও তাই। যেহেতু ১৯৭৯, ১৯৮১ সালে ত্রিপুরায় ও ১৯৮৪ সালে মিজোরামে জুম্ম জনগণকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। প্রতিবারে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে জুম্ম শরণার্থীরা স্থায়ীভাবে নিজ বাসভূমিতে থাকতে পারেনি। বিগত ১৯৮৬ ও ১৯৮৯ সালে আবার ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়ে আজও তাদের উদ্বাস্তু জীবন কাটাতে হচ্ছে। তারা চায় তাদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান, নিজ বাসভূমিতে তাদের জীবন ও সম্পত্তির পূর্ণ নিরাপত্তা, যেন তাদেরকে বারবার বিদেশে আশ্রয় নিতে না হয়। এজন্য তাদের অন্যতম দাবী হচ্ছে—জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের ফলপ্রসু আলোচনা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান।

আজ দেশের সকল শান্তিকামী জনতা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবি, ছাত্র-শিক্ষক মানবাধিকার কর্মী ও সকল জুম্ম জনগণের একান্ত কাম্য হচ্ছে—নির্বাসিত সকল জুম্ম শরণার্থীরা স্বদেশে ফিসে আসুক। আর ত্রিপুরায় অবস্থানরত জুম্ম শরণার্থীরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে নিশ্চয় উদগ্রীব। ভারতসহ বিশ্বের সকল মানবাধিকার সংস্থার মানবাধিকার কর্মীগণও জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে সব রকম প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। বিশ্বের মানবতার দৃষ্টিভঙ্গী আজ প্রতিটি শরণার্থী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও সুখে-শান্তিতে স্বদেশ ভূমিতে বসবাসের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য খুবই সোচ্চার হয়ে উঠেছে। তাই ভারতের আশ্রিত তামিল শরণার্থীরা স্বদেশভূমি শ্রীলংকায়, পাকিস্তান ও ইরাণে আশ্রিত আফগানীরা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে উদ্বাস্তুরা নিজ নিজ দেশের মাটিতে ফিরতে শুরু করেছে। বাংলাদেশ সরকারও বিভিন্ন দেশে ও জাতিসংঘে দরবার করে বার্মার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বার্মায় ফেরৎ পাঠাচ্ছে। কিন্তু মাত্র অর্ধলক্ষাধিক জুম্ম শরণার্থীকে স্বদেশে ফেরৎ আনতে বাংলাদেশ সরকারের এত গড়িমসি কেন? এক্ষেত্রে অবশ্যই বাংলাদেশ সরকারকে সবচেয়ে বেশী সদিচ্ছার পরিচয় দিতে হবে। যেহেতু জুম্ম শরণার্থীদের দাবী ন্যূনতম আর্থিক সুবিধা ও তাদের নিজ বাস্তুভিটা ও জমি ফেরৎ দানের দাবী মাত্র। তাই এক্ষেত্রে সরকারের গুরুতর কোন পুনর্বাসন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বিপুল অর্থের প্রয়োজনও নেই বলে এটা সরকারের অসাধ্যের ব্যাপারও নয়। কেবলমাত্র আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ, বেদখলকারীদের উচ্ছেদ করে জুম্ম উদ্বাস্তুদের জমি ফেরৎ প্রদান করার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। কিন্তু স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তারা বহিরাগতদের লোক দেখানো সামান্য ব্যবধানে সরিয়ে নিয়ে ভূমি সমস্যার সমাধান করতে চাচ্ছে। এতে জুম্ম ও অজুম্মদের ভূমি বিরোধের কোন সমাধান হচ্ছে না। বরং উত্তরোত্তর জটিল আকার ধারণ করছে। অদূর

ভবিষ্যতে জুম্ম ও অজুম্মদের ভূমি বিরোধ দেখা দিলে অবশ্য প্রত্যাবর্তিতদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। এক্ষেত্রে সরকারের উচিত বেদখলকারীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রত্যাহার করা।

সর্বোপরি এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন। সরকারও এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে জনসংহতি সমিতির সাথে যুদ্ধবিরতি ও সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। জনসংহতি সমিতি চায়—জুম্ম জনগণ দেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিতে বসবাস করুক। জুম্ম শরণার্থীদের আশু স্বদেশ প্রত্যাবর্তনও জনসংহতি সমিতির কাম্য। তাই জনসংহতি সমিতি বারবার যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়িয়ে জুম্ম শরণার্থীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের বর্তমান হাল হকিকত

শ্রী সুপর্ণ

ভূমিকা

সরকার কর্তৃক প্রতিশ্রুত ১৬ দফা গুচ্ছ প্রস্তাবের প্রতি আস্থা রেখে ভারতের ত্রিপুরাস্থ আশ্রয় শিবির থেকে আগষ্ট '৯৪ ইং এর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ৫ হাজারের অধিক শরণার্থী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। এসব প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীরা স্বদেশে কি অবস্থায় রয়েছেন, প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তারা পুনর্বাসিত হতে পেরেছেন কিনা, এই বিষয়টি আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য জুম্ম জনগণ, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও মানবতাবাদী সংস্থার কাছে এক বিরাট জিজ্ঞাস্য হয়ে উঠেছে। তাই এ ক্ষুদ্র পরিসরে এসব জুম্ম শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন, পুনর্বাসন সংক্রান্ত খতিয়ান তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া

মে '৯২ ইং এ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ভারত সফরে গিয়ে সেদেশের প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাও এর কাছ থেকে জুম্ম শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের কাজ দ্রুততর করার ব্যাপারে ইতিবাচক সম্মতি আদায় করতে পেরেছেন। উভয় প্রধানমন্ত্রীর ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে বাংলাদেশের যোগাযোগমন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহম্মদের নেতৃত্বে ৪ সদস্যক একটি বাংলাদেশী প্রতিনিধিদল ২—৯ই মে, '৯৩ ইং পর্যন্ত ভারত ও ত্রিপুরার শিবিরগুলি সফর করেন। এই সফরে জনাব অলি আহম্মদ ভারতের পররাষ্ট্র বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী সলমন খুরশিদের সঙ্গে ৩০ দিনের মধ্যে শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়া শুরু করার এক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করেন। ১০ই মে, '৯৩ ইং সোমবার বাংলাদেশ ও ভারতে একই সঙ্গে প্রচারিত এক যুক্ত ঘোষণায় এ কথা উল্লেখ করা হয়।

এরপর ২৬শে মে, '৯৩ ইং স্বরাষ্ট্র সচিব আজিম উদ্দীনের নেতৃত্বে ৪ সদস্যক বাংলাদেশের এক প্রতিনিধিদল ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ডি পি সিং এর নেতৃত্বে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। উক্ত

বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যাবাসনের দিনক্ষণ চূড়ান্ত করার জন্য ১লা জুন, '৯৩ ইং তারিখে আবার খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন ও দক্ষিণ ত্রিপুরা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রশাসনের মধ্যেকার এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং ৮ই জুন, '৯৩ ইং থেকে পর্য্যায়ক্রমে শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন শুরু করার এক সমঝোতা চুক্তি হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শরণার্থী কল্যাণ পরিষদের পেশকৃত ১৩ দফা দাবী-দাওয়া পরিপূরণের সুনির্দিষ্ট কোন আশ্বাস না পেয়ে শরণার্থীরা উক্ত ৮ই জুন তারিখে প্রত্যাবর্তন করতে রাজী হয়নি। ফলে বাংলাদেশের প্রত্যাবাসন সম্পর্কিত আয়োজনও ভেস্তে যায়। শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ ভেস্তে গেলেও আন্তর্জাতিক জনমতের চাপের মুখে বাংলাদেশ সরকার শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চালু করতে মরিয়া হয়ে উঠে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যোগাযোগের মাধ্যমে ভারত সরকার ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ পরিষদের নেতৃবৃন্দের কাছে অনুনয়-বিনয়ও অব্যাহত রাখে। এরপর প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ-ভারত ও শরণার্থী কল্যাণ পরিষদের মধ্যে বেশ কয়েকটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ও শরণার্থীদের নিরাপদ ও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের তাদের ১৩ দফা দাবী পূরণ না হওয়ায় শরণার্থী প্রতিনিধিরা প্রত্যাবর্তনে রাজী হয়নি। পরিশেষে ১৬ই জানুয়ারী '৯৪ ইং রামগড়ে বাংলাদেশ, ভারত ও শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সর্বশেষ ত্রিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে শরণার্থী নেতৃবৃন্দ তাদের বেদখলকৃত ভূমি ফেরৎ প্রদানসহ ১৬ দফা গুচ্ছ প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী '৯৪ইং তারিখ হতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে রাজী হন এবং বাংলাদেশ সরকারের সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এও চুক্তি হয় যে, ভারত সরকারের মাধ্যমে পরবর্তীতে প্রত্যাবর্তনেচ্ছুক শরণার্থীদেরকে প্রদেয় সুযোগ-সুবিধাদির শর্তাবলী বাংলাদেশ সরকার শরণার্থী নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছাবেন। সেই অনুসারে ১২ই ফেব্রুয়ারী '৯৪ ইং তারিখে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিদলের মধ্যে রামগড়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে শরণার্থীদের এক ১৬ দফা গুচ্ছ প্রস্তাব হস্তান্তর করেন।

সরকার প্রদত্ত প্রত্যাবাসন শর্তাবলী

১৬ দফা গুচ্ছ প্রস্তাবের শর্তাবলীর মধ্যে উল্লেখ ছিল যে, প্রতিটি প্রত্যাগত শরণার্থী পরিবারকে গৃহ নির্মাণের জন্য ২ বাণ্ডিল ঢেউটিনসহ নগদ ১০,০০০ টাকা প্রদান এবং নগদ ৫,০০০ টাকা বৃদ্ধির আবেদন সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করা, গৃহ নির্মাণের সাহায্য স্বরূপ কাঠের পারমিট প্রদান, চাষযোগ্য জমির মালিক প্রতিটি পরিবারের জন্য ১ জোড়া হালের বলদ প্রদান, ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মুকুব, যোগ্যতানুসারে প্রত্যাগত বেকার যুবকদের চাকুরীর সুবিধাদি প্রদান, চাকুরীর ক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথিল করণ, পূর্বে যাদের চাকুরী ছিল তাদেরকে পুনর্বহাল করণ, শিবিরে অধ্যয়নরত সকল ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ও কলেজের সমমান শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ প্রদান, মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদেরকে কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে বিশেষ পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ প্রদান, প্রত্যাগতদেরকে গুচ্ছগ্রামে প্রত্যাবর্তিত না করা, প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় বিরোধী দলীয় সাংসদ মিঃ রাশেদ খান মেনন, মিঃ শাহজাহান চৌধুরী ও মিঃ মোস্তাক আহম্মদ চৌধুরীকে অন্তর্ভুক্তির বিবেচনা করা, প্রত্যাবাসিত সকল উপজাতীয় হেডম্যানদের পুনঃবহাল করা, ৩০শে জুন '৯৪ ইং পর্যন্ত সাধারণ ক্ষমার মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ, পূর্ববর্তী সরকার কর্তৃক অভিযুক্ত সকল শান্তিবাহিনী সদস্যদের অভিযোগ প্রত্যাহার করা, সিভিলিয়ান এরিয়া থেকে নিরাপত্তা ক্যাম্পসমূহ প্রত্যাহারকরণসহ স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজিত এলাকায় ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত না করা, প্রকৃত মালিকদেরকে স্ব-স্ব ধান্যজমি ফেরৎ

প্রদান, প্রত্যাগত বেকারদের বেলায় চাকুরীর সুযোগ-সুবিধাদি বৃদ্ধি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করা, ছয় মাসের জন্য ঘোষিত রেশন সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

বাংলাদেশ সরকারের প্রদত্ত উপরোক্ত ১৬ দফা প্রস্তাবের শর্তাদির প্রতি আস্থা রেখে ১৫—২২শে ফেব্রুয়ারী '৯৪ ইং এ প্রথম পর্যায়ে ৩৭৯ পরিবারের ১৮৪৬ জন শরণার্থী এবং ১২শে জুলাই—৫ই আগষ্ট'৯৪ ইং এ দ্বিতীয় পর্যায়ে ৬৯৮ পরিবারের মোট ৩৩২৩ জন শরণার্থী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

শরণার্থী কল্যাণ সমিতির ১ম রিপোর্ট
(পুনর্বাসন পর্যবেক্ষণ)

প্রথম পর্যায়ের প্রত্যাবাসনের পর প্রত্যাগত শরণার্থীদেরকে ১৬ দফা গুচ্ছ প্রস্তাবের অধীনে পুনর্বাসনের কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা সরকার বারংবার দাবী করতে থাকেন ও ২য় পর্যায়ে প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়া চালু করার জন্য ভারত সরকারও শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। বাংলাদেশ সরকারের এই দাবীর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য গত ২৫—২৯শে এপ্রিল '৯৪ ইং ৩ জন ভারতীয় কর্মকর্তাসহ শরণার্থী কল্যাণ সমিতির ১১ সদস্যক এক প্রতিনিধিদল পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরে আসেন। শরণার্থী প্রতিনিধিবৃন্দ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার খাগড়াছড়ি সদর, পানছড়ি, মাটিরাঙ্গা, রামগড়, দিঘীনালা প্রভৃতি এলাকা এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার লংগদু থানার ইয়ারেংছড়ি, চঙড়াছড়ি, আটরকছড়া, পাগোজ্যাছড়ি প্রভৃতি এলাকা সফর করেন ও বহু গণ্যমাণ্য ব্যক্তি, বুদ্ধিজীবী, ছাত্রনেতা, প্রত্যাগত শরণার্থীর সাথে আলাপ করেন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অভিযোগ গ্রহণ করেন। প্রাপ্ত এইসব অভিযোগ ও তাদের সফরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে শরণার্থী কল্যাণ সমিতি ১৩ই মে '৯৪ ইং তারিখে এক পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশ করেন। এই রিপোর্টে ভূমি বেদখল, ধর্মীয় পরিহানি, ধর্ষণ ও নির্যাতনের অনেক অভিযোগ আনা হয়। এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, কতিপয় শরণার্থী ছাড়া অধিকাংশ প্রত্যাগত শরণার্থীরা বহিরাগত মুসলিম বাঙ্গালী ও নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্প দ্বারা বেদখলকৃত তাদের জমি ও বাস্তুভিটা ফিরে পায়নি। ১৬ দফার মধ্যে ১০ হাজার টাকা ও ২ বাণ্ডিল সি আই টিন ছাড়া বাকী সুযোগ-সুবিধাদি এখনো পূরণ করা হয়নি। তাছাড়া এ সফরে সমিতির নেতৃবৃন্দ ১৬ দফা গুচ্ছ প্রস্তাবের পরিবর্তে মোঃ আতিকুল ইসলাম চৌধুরী, পরিচালক, প্রশাসন এর ১২/২/৯৪ইং এর স্বাক্ষরিত ১২ দফা পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কর্মসূচী হস্তগত করেন যা ১৬ দফা গুচ্ছ প্রস্তাবের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যবিহীন। তাই সরকার প্রতিশ্রুত পুনর্বাসন সংক্রান্ত ১৬ দফা গুচ্ছ প্রস্তাবের পূর্ণ বাস্তবায়ন করেনি। রিপোর্টে আরো বলা হয় যে, সরকার ও জে এস এস এর মধ্যে যুদ্ধবিরতির ফলে অবস্থা স্বাভাবিক থাকলেও যেকোন সময় পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ত্রিপুরায় আশ্রিত জুম্মরা ছাড়াও বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের ফলে যে সব জুম্ম পরিবার বাস্তুভিটাহারা হয়েছে, তারা নিজ নিজ বাস্তুভিটায় ফিরে আসতে পারেনি। জুম্ম শরণার্থীদের পেশকৃত ১৩ দফায় অন্তর্ভুক্ত বিতর্কিত রাজনৈতিক বিষয়গুলো সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যেকার বৈঠকে কোন অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে না, যা ব্যতিরেকে জুম্ম শরণার্থীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন ও সম্মানজনক প্রত্যাবাসন সম্ভব নহে। রিপোর্টে আরো দাবী করা হয় যে, প্রদত্ত ১৬ দফা গুচ্ছ প্রস্তাব বাস্তবায়নে ও শরণার্থীদের নিরাপত্তা এবং সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য জনসংহতি সমিতির সাথে ফলপ্রসু সমাধানে আসার আবেদন জানানো হয়। জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসনের স্বদেশে উদ্বাস্তু পরিবারগুলিও পুনর্বাসন করতে হবে এবং জুম্ম

শরণার্থীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য UNHCR ও ICRC কে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ায় জড়িত করার আবেদন জানানো হয়।

প্রত্যাগতদের অভিযোগ ও সাংবাদিক সম্মেলন

এদিকে প্রত্যাগত শরণার্থীরাও প্রতিশ্রুত ১৬ দফা গুচ্ছ প্রস্তাব বাস্তবায়ণ না করার অভিযোগে সাংবাদিক সম্মেলন ও মিছিল করতে থাকে। তাদের অভিযোগমূলে জানা যায় যে, পানছড়ি থানার কালানালের ২৩ পরিবার, পায়ঃ কার্বারী পাড়ায় ১৯ পরিবার প্রত্যাগত পরিবার তাদের স্ব-স্ব জমি বহিরাগতদের দখলে থাকায় নিজ নিজ বাস্তুভিটায় ফিরে যেতে পারেনি। পাইলট কর্ম কার্বারী পাড়ায়, ববিনিং কার্বারী ও অন্যান্য অনেক জায়গায় অনুপ্রবেশকারীদের বসতি থাকায় প্রত্যাগত অনেক পরিবার নিজ নিজ বাস্তুভিটায় যেতে পারছে না। ত্রিশংকু নগি চাকমা (পূজগাং) বন্দোবস্তকৃত জায়গা অনুপ্রবেশকারীদের বেদখলে ও সরকারী বিল্ডিং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে সরকারের কাছে অভিযোগ আনলেও তার কোন সুরাহা হয়নি। ২১।১১।৯৪ ইং তারিখে চন্দ্র বিকাশ চাকমা (২১), পিতা মনোরম চাকমা গ্রাম-কালাচান মহাজন পাড়া, বড় মেরুং, দিঘীনালা, নিজ জমি দেখতে গেলে অনুপ্রবেশকারীদের সর্দার রেজাউর রহমানের দলবল কর্তৃক প্রহৃত হন। ২৬।১১।৯৪ ইং তারিখে প্রত্যাগত কালাধন চাকমা (৩০), পিতা, দিবাকর চাকমা, কুকিছড়া, ভাইবোনছড়া, খাগড়াছড়ি-তে ভাইবোনছড়া বাজার থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। প্রত্যাগত কিশোরী মিস্ শোভারাণী ত্রিপুরা (১৬), পিতা তাইন্দং ত্রিপুরা, পানি আনতে গিয়ে অনুপ্রবেশকারী কর্তৃক ধর্ষিতা হন। এ রকম হাজারো অভিযোগের চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠে সেপ্টেম্বর '৯৪ ইং চট্টগ্রামে ও ১১ই ডিসেম্বর '৯৪ ইং প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী নেতৃবৃন্দের ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলন থেকে। এই সাংবাদিক সম্মেলনে শরণার্থী নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন যে, সরকার প্রতিশ্রুত ১৬ দফা বাস্তবায়ন কর্মসূচী যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না করায় এখনো অনেক শরণার্থী নিজ জায়গা জমি, বাস্তুভিটা ও চাকুরী ফিরে পায়নি। হালের বদল প্রদানসহ ২০০ ঘনফুট কাঠের পারমিট, বেকারদের কর্মসংস্থান প্রভৃতির ক্ষেত্রেও সরকার চরম অবহেলা প্রদর্শন করে যাচ্ছেন বলেও তারা অভিযোগ আনেন। সম্মেলনের শেষে তারা সরকারী ঘোষণা মোতাবেক শরণার্থীদের আইনগত নিরাপত্তা, অনুপ্রবেশকারীদের কর্তৃক বেদখলকৃত জমি ফেরৎদান, কালাধন চাকমার নিঃশর্ত মুক্তি, চন্দ্র বিকাশ চাকমার আক্রমণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানসহ প্রতিশ্রুত ১৬ দফা পুনর্বাসন কর্মসূচী পূর্ণবাস্তবায়নের দাবী জানান।

শরণার্থী কল্যাণ সমিতির পুনর্বাসন পর্যবেক্ষণ সফরের ২য় রিপোর্ট

১ম ও ২য় পর্যায়ে প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা পুনঃ পর্যবেক্ষণের জন্য গত ১৫-১৬ই মার্চ জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করেন। এই সফরে দক্ষিণ ত্রিপুরার ডি, এমসহ ২ জন উচ্চপদস্থ ভারতীয় কর্মকর্তাও ছিলেন। সফর শেষে তারা সফরের অভিজ্ঞতার আলোকে গত এপ্রিলে এক রিপোর্ট প্রকাশ করেন। এই রিপোর্টে বহিরাগতদের বেদখল থেকে প্রত্যাগতদের জমি ফিরে না পাওয়া পুনর্বাসন কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এক বড় বাধা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কারণ প্রত্যাগতদের অবর্তমানে অনেক বহিরাগত সরকারী যোগসাজসে নিজ নিজ নামে জমি রেজিষ্ট্রিভুক্ত করে রেখেছে, যার প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেক প্রত্যাগত জুম্ম কোর্টে অপমানিত ও লাঞ্চিত হয়েছেন। প্রত্যাগতদের বাস্তুভিটার সংলগ্ন অনেক নিরাপত্তা ক্যাম্প ও বহিরাগতদের বসতি বর্তমান থাকায় অনেকেই নিজ

বাস্তুভিটায় যেতে পারেননি। ১৬ দফা গুচ্ছ প্রস্তাবের শর্তানুসারে চাকুরীজীবীদের বয়োজ্যেষ্ঠতা ভিত্তিক সুযোগ-সুবিধাদি প্রদান করা হয়নি, আনুষঙ্গিক প্রয়োজনাদি মিটানোর জন্য প্রত্যাগতদের অতিরিক্ত ৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়নি, ছয় মাসের রেশন প্রদানে শর্ত মোতাবেক ১২ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও ১২ বৎসর উর্ধ্ব থেকে পূর্ণ বয়স্ক হিসেবে বিবেচনা করাতে প্রত্যাগতদের খাদ্যের ঘাটতি পূরণ হয়নি, বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের ফলে স্বদেশের উদ্বাস্তু পরিবারদের নিজ বাস্তুভিটায় পুনর্বাসন করা হয়নি, পুনর্বাসন কমিটির চেয়ারম্যানের পদত্যাগের ফলে খালি হওয়া পদটি এখনো পূরণ হয়নি, কতিপয় বৌদ্ধ মন্দির থেকে নিরাপত্তা বাহিনীর পোষ্ট তুলে নেয়া হয়নি, ইত্যাদি অভিযোগ তারা প্রকাশিত পর্যবেক্ষণ রিপোর্টে উল্লেখ করেন। এই সব শর্তাবলী পূরণ করা না হ'লে ওর পর্যায়ে শরণার্থী প্রত্যাবাসন সম্ভব হবে না বলেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

ত্রিপুরার রাজ্যপালের বাংলাদেশ সফর

শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রকাশিত পুনর্বাসন পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট, অন্যান্য বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হলে প্রত্যাবাসনের পরবর্তী পর্যায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সরকার এইসব অভিযোগকে ধামাচাপা দিতে বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বন করে। এইসব অপকৌশলের একটা অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার ত্রিপুরার রাজ্যপাল শ্রী রমেশ ভাণ্ডারীকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরের এক প্রাণাকুতি আমন্ত্রণ জানান। বাংলাদেশ সরকারের এই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে শ্রী ভাণ্ডারী ১৮ই এপ্রিল '৯৪ ইং ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হন। ঢাকা থেকে ১৯শে এপ্রিল শ্রী ভাণ্ডারীর ত্রিপুরার পথে খাগড়াছড়ি স্থানীয় প্রশাসন কতিপয় সাজানো কৃত্রিম রমরমা পুনর্বাসন প্রকল্প দেখান ও পূর্বনির্ধারিত কতিপয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তি ও প্রত্যাগত শরণার্থীর সাথে শ্রী ভাণ্ডারীর আলাপ জুড়িয়ে দেন, যারা প্রশাসনের শিখিয়ে দেয়া বুলি আউড়িয়ে তার সন্তুষ্টিবিধান করেন। সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা সুনির্দিষ্ট কতিপয় পুনর্বাসন প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা অবলোকন ও সরকারের শিখিয়ে দেয়া কতিপয় ব্যক্তির বুলি শ্রবণ করে শ্রী ভাণ্ডারী স্বাভাবিক চিত্তে সত্যি সত্যিই বিমোহিত হয়ে পড়েন। কিন্তু উপজাতীয়দের কতিপয় মহলও বাস্তব পুনর্বাসন চিত্র তুলে ধরবেন এসব প্রত্যাগতদেরকে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যে দেয়া হয়নি তা তিনি মোটেই ঠাহর করতে পারেননি। তাই বানানো পুনর্বাসনের রমরমা চিত্র অবলোকনের অভিজ্ঞতার আলোকে ত্রিপুরায় ফিরে গিয়ে বাংলাদেশ সরকারের পুনর্বাসন কর্মসূচী যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে বলে মন্তব্য করলেন শ্রী ভাণ্ডারী এবং শরণার্থী নেতাদেরকেও বার বার পুনর্বাসন কর্মসূচীর সঠিকভার কথা বলে পরবর্তী প্রত্যাগমনে উৎসাহী হতে অনুরোধ করেই গেলেন।

প্রত্যাবাসন কমিটির চেয়ায়ম্যান ও অন্যান্য সদস্যের পদত্যাগ

উপজাতি শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ব্যাপারে সরকার কর্তৃক ঘোষিত কতিপয় বিষয় বাস্তবায়নে ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের গড়িমসি এবং কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ বিবেচনা বা অনুমোদন করতে সরকারের অহেতুক কালক্ষেপন ও ব্যর্থতা ইত্যাদির কারণে কমিটির চেয়ারম্যানের পদে বহাল থাকা ব্যক্তিগতভাবে সমীচিন মনে না করে অবশেষে শ্রী কল্পরঞ্জন চাকমা কমিটির চেয়ারম্যানের পদত্যাগ করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, সরকার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক কিছু কিছু পরিবার স্ব-স্ব বাস্তুভিটা ফিরে পেলেও আনুষঙ্গিক গোলমাল ও নিরাপত্তাহীনতা এখনো প্রকট। এ পর্যন্ত চাষযোগ্য ভূমির অধিকারী অর্ধেক প্রত্যাগত পরিবার হালের বলদ পায়নি এবং ভূমিহীন প্রত্যাগতদের ৫ একর জমি বন্দোবস্তসহ বলদের সমপরিমাণ টাকা প্রদান করা হয়নি। এইসব অভিযোগ এনে তিনি চেয়ারম্যানের পদ ছেড়ে দিতে

বাধ্য হয়েছেন বলে উল্লেখ করেন। শর্তানুসারে প্রত্যাগত-দের পুনর্বাসন সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধাদি সরকারের কাছ থেকে লাভ করতে না পারায় উপজাতীয় শরণার্থী পুনর্বাসন কমিটির তিন সদস্য— ১) সুপ্রিয়া চাকমা, ২) বিমলেন্দু চাকমা ও ৩) থৈইহ্লাপু চৌধুরীও গত ৬-১২-৯৪ইং তারিখে কমিটির সদস্যপদ প্রত্যাহার করেন।

সুষ্ঠু পুনর্বাসন সম্পর্কিত সরকারী অপপ্রচারণা

প্রত্যাগতদের পুনর্বাসনে সরকারের গড়িমসি ও প্রত্যাগত-দের চরম দুর্গতি সম্পর্কে হাজারো অভিযোগ সত্ত্বেও সরকার কিন্তু এদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত যাবতীয় সুযোগ-সুবিধাদি প্রদান করা হচ্ছে বলে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে অপ-প্রচারণার বেসাতী অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে খাগড়াছড়ি থেকে প্রকাশিত "সাপ্তাহিক পার্বতী" খুললেই এই অপপ্রচারণার খোলস উম্মোচিত হয়ে উঠে। উক্ত সাপ্তাহিকীর ১৩ই ফেব্রুয়ারী '৯৫ইং ২৬তম সংখ্যায় "সরকার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকারী উপজাতীয় শরণার্থীদের জন্য বিশেষ সুবিধার কথা ঘোষণা করেছে", ৫ই মে '৯৫ইং ৩৮তম সংখ্যায় "স্বেচ্ছায় প্রত্যাগত শরণার্থীদেরকেও সরকার ঘোষিত সকল সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে" প্রভৃতি শিরোনামে পুনর্বাসনের উল্লাসনৃত্য দারুণ অভিনব কায়দায় পরিবেশন করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে ত্রিপুরায় শিবির সফরে গিয়ে বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ কল্পিত পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার গুণকীর্তন শুনাইয়ে প্রত্যাবর্তনে শরণার্থীদের উদ্বুদ্ধ করার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে আসছে। গত বছরের এপ্রিলে ত্রিপুরার রাজ্যপাল শ্রী রমেশ ভাণ্ডারীকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরের আমন্ত্রণ ও মিথ্যা প্রচারণার অপকৌশলের একটা অংশ। কারণ, শ্রী ভাণ্ডারীর এই সফরে সুনির্দিষ্ট গুটি কয়েক রমরমাভাবে বানানো পুনর্বাসন প্রকল্প মাত্রই দেখানো হয়েছিল। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের ১০টি ভিন্ন ভিন্ন বিদেশী দূতাবাসের কর্মকর্তাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে আমন্ত্রণ করে এনে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন প্রকল্প ও অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প দেখানো হয়। তাদের এই সফরে শুধুমাত্র সরকারী কর্মকর্তা ও স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ানই তাদেরকে সরকারের গুণকীর্তন শুনাইয়েছেন। তাদের এই গুণকীর্তন শ্রবণে ও কৃত্রিমভাবে বানানো পুনর্বাসন প্রকল্প চাক্ষুষে সত্যি সত্যি অতিথিবৃন্দ অভিভূত হয়ে গেলেন বলে মনে হয়। কিন্তু সরকারী অপপ্রচারণার বেসাতী ধরতেই পারলেন না। এইভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন সম্পর্কে সরকার মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

সরকারী অপপ্রচারণার খোলস উম্মোচিত

প্রত্যাবাসনের কল্পিত অপপ্রচারণার খোলস বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে উম্মোচিত হয়ে পড়েছে। কথায় বলে —'ধর্মের ঢোল আপনিই বাজে'। গত ১২ই ডিসেম্বর '৯৪ইং এর কতিপয় দৈনিকের শিরোনাম দিয়ে এর প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। দৈনিক ভোরের কাগজের সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ "প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থীরা নতুন করে হয়রানির শিকার" দৈনিক জনতার "প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের সরকার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি" দৈনিক আজকের কাগজের সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ "প্রত্যাগত উপজাতীয়দের দেয়া ১৬ দফা বাস্তবায়িত হয়নি" দৈনিক বাংলার বাণীর "পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রত্যাগত শরণার্থীদের ১৮ দফা দাবী পুরণের আহ্বান" প্রভৃতি শিরোনামে সরকারী পুনর্বাসন ব্যবস্থাপনার নগ্ন চিত্র পরিস্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। অতি সম্প্রতি বিবিসি রেডিও টি ভি সাংবাদিকদের একটি দল খাগড়াছড়িতে প্রত্যাগত শরণার্থীদের অবস্থা দেখতে আসেন বিশিষ্ট সাংবাদিক কুররাতুল আইন তাহ্মিনা। ঢাকা ফিরে গিয়ে ২৫শে মে '৯৫ ইং দৈনিক ভোরের কাগজে "খাগড়াছড়িতে তিন দিন কিছু অপ্রিয় সত্য কথা" শিরোনামে তার এক নিবন্ধে পুনর্বাসনের এক বিরূপ চিত্র ফুটে উঠেছে। এ নিবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রতিটি সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় রথী মহারথী কর্তা ব্যক্তিরাই নাকি নির্বাচন পরিদর্শকের

ভূমিকা নিতে চাইলেন। তাদের এই ভূমিকা নিতে চাওয়া স্থানে কেহ যেন আসল রহস্য ফাঁস করে দিতে না পারে। তিনি নিবন্ধে আরো উল্লেখ করেন যে, ফিরে আসা শরণার্থী যাদের সঙ্গে কথা হয়েছিল, তারা সবাই ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার অনুভূতি জানিয়েছিলেন। বেশ কয়েক জন ফিরে আসা পাহাড়ী তাদের জমি ফিরে পায়নি বলে তাকে জানিয়েছিলেন। কারণ, বাঙ্গালীরা জোর করে চাষ করছে। কুররাতুল তাহ্‌মিনা আখতারের এই নিবন্ধেই প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে যে, প্রত্যাগত শরণার্থীরা চুক্তি মোতাবেক পুনর্বাসিত হচ্ছে না।

শেষ কথা

ত্রিপুরায় অবস্থারত অবশিষ্ট জুম্ম শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনে উদ্বুদ্ধ করতে সরকার প্রত্যাগতদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির বর্ণনাতীত সাফাই গেয়ে যাচ্ছেন। অপরদিকে প্রত্যাগতদের পুনর্বাসন কমিটি ও প্রত্যাগতদের বিভিন্ন অভিযোগ এবং শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রত্যক্ষ সফরের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে প্রত্যাগতরা প্রতিশ্রুতি মোতাবেক পুনর্বাসিত হচ্ছে না বা সরকার প্রদত্ত শর্তাদি পরিপূরণ করছেন না। কাজেই এমতাবস্থায় ত্রিপুরাস্থ শরণার্থী ফিরে আসবেন না বলে মতামত ব্যক্ত করে যাচ্ছেন। তাছাড়া এই শরণার্থী সমস্যা পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যা থেকে উদ্ভূত। কাজেই এই রাজনৈতিক সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান না হলে শরণার্থী সমস্যারও স্থায়ী সমাধান কিছুতেই হতে পারে না।

সংবাদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার উপর সেমিনার

গত ২রা জুন '৯৫ইং শুক্রবার, পার্বত্য চট্টগ্রাম মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ জাতীয় কমিটির উদ্যোগে ঢাকাস্থ জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার উপর এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের আহ্বায়ক লুৎফর রহমান শাহজাহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন—ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন, গণ ফোরামের সাইফুদ্দিন আহম্মেদ মানিক, ডেপুটি এটর্নি জেনারেল এ, এফ, হাসান আরিফ, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সৈয়দ হাসান ইমাম, আনু মোহাম্মদ, সুরবিন্দু শেখর চাকমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কে, এস, মং, ব্যারিষ্টার সারা হোসেন, কবিতা চাকমা প্রমুখ।

সেমিনারে বক্তরা পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিসত্তা সমূহের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সাংবিধানিক স্বীকৃতিদান এতদ্ অঞ্চলে সংঘটিত গণহত্যা, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি ঘটনাবলীর তদন্ত, পাহাড়ী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান, সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণমুক্ত প্রশাসনসহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্যান্য দাবীসমূহ মেনে নেয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান।

রাশেদ খান মেনন তার বক্তৃতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে স্ব-অধিকার জোরদার, ভূমি বিরোধ দূর ও অভিবাসন সমস্যার সমাধানের দাবী জানান। সাইফুদ্দিন আহম্মেদ মানিক রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবেই পার্বত্য সমস্যা দীর্ঘায়িত হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন যে, মানবিক দিক বিবেচনা করে অবশ্যই আইনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার উপর রাজনৈতিক সমাধান, শরণার্থী প্রত্যাবাসন, মানবাধিকার, ভূমি সমস্যা এবং ভাষা ঐতিহ্য

ও সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ের উপর পৃথক সেমিনার ও মুক্ত আলোচনা করা হয়।

বৈদেশিক মিশন প্রধানদের কাছে প্রত্যাগত শরণার্থীদের স্মারকলিপি

গত ২রা জুন '৯৫ইং বাংলাদেশস্থ ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী, সুইডেন, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, পাকিস্তান, ইরানসহ মোট ১০টি বৈদেশিক মিশন প্রধান ভারত থেকে প্রত্যাগত শরণার্থী পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিদর্শনে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরে আসেন। তাঁদের সফরকালে প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ১৬ দফা বাস্তবায়ন কমিটি (দিঘীনালা থানা শাখা) প্রত্যাগতদের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানিয়ে এক স্মারকলিপি পেশ করেন। স্মারকলিপিতে সরকার প্রতিশ্রুত ১৬ দফা গুচ্ছ প্রস্তাব বাস্তবায়নে গড়িমসি করার ফলে প্রত্যাগতরা অনেকেই নিজ জমিজমা ও বাস্তুভিটা ফিরে পাননি, হালের বলদের টাকা, আনুষঙ্গিক খরচাদি মিটানোর জন্য অতিরিক্ত ৫ হাজার টাকা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা না করা, গৃহ নির্মাণের সাহায্যস্বরূপ কাঠের পারমিট প্রদান না করা, চাকুরীজীবীদের অনেকেই চাকুরী ফিরে না পাওয়া, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হতে নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্প ও পোষ্ট তুলে না নেয়া, পুরনো মিথ্যা মামলায় জড়িত করে কতিপয় প্রত্যাগত শরণার্থীকে জেলবন্দী করে রাখা ইত্যাদি লাঞ্ছনা-বঞ্চনার সম্মুখীন হওয়ার কথা তুলে ধরা হল।

স্মারকলিপিতে পুনর্বাসন কমিটির চেয়ারম্যানের খালি পদসহ অন্য তিন সদস্যের খালি পদ পূরণ করে পুনর্বাসন কমিটির কার্যক্রম পুনঃ চালু করা ও ১৬ দফা গুচ্ছ প্রস্তাব অনুসারে যেন প্রত্যাগত সকল জুম্মরা প্রত্যাবাসিত হয়ে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি পেতে পারেন তজ্জন্য প্রতিনিধি দলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করা হয়।

২০শে জুলাই পর্যন্ত অস্ত্র-বিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি

পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ও চলমান সংলাপের গতিকে অব্যাহত রাখার মানসে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি আগামী ২০শে জুলাই পর্যন্ত অস্ত্র-বিরতির মেয়াদ বাড়াতে সম্মত হয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারপক্ষীয় কমিটি পক্ষ থেকে নতুন প্রস্তাব সম্বলিত একটি চিঠি ২রা জুন '৯৫ ইং যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক শ্রীহংসধ্বজ চাকমার মাধ্যমে সমিতির কাছে পৌঁছানো হয়। এই চিঠিতে সরকার ৩১শে আগষ্ট '৯৫ ইং পর্যন্ত অস্ত্র-বিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি, ১২ই জুলাই '৯৫ ইং সাব-কমিটির সাথে বৈঠকে প্রস্তাব করা হয়েছে। ৩০শে জুনের মধ্যে আটককৃত সমিতির সদস্যদের মুক্তিদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়। ১২ই জুলাইয়ের অনুষ্ঠিতব্য সাব-কমিটির বৈঠকে সরকার পক্ষ সমিতির কাছে খসড়া রূপরেখা উপস্থাপন করা হবে বলেও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়। সরকার পক্ষের উপরোক্ত প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে ৩০শে জুন '৯৫ ইং এর মধ্যে আটককৃত সমিতির অবশিষ্ট ১০ (দশ) সদস্যদের মুক্তি দেয়ার শর্তসাপেক্ষে প্রস্তাবিত ১২ই জুলাই তারিখে বৈঠক অনুষ্ঠিত করতে এবং প্রস্তাবিত ৩১শে আগষ্ট '৯৫ইং এর পরিবর্তে ২০শে জুলাই '৯৫ ইং পর্যন্ত উভয়পক্ষে যুদ্ধ-বিরতির মেয়াদ বাড়াতে জনসংহতি সমিতি সম্মতি প্রদান করেছেন।

খাগড়াছড়িতে জমির ভুয়া বন্দোবস্তির রহস্য ফাঁস

পার্বত্য চট্টগ্রামে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যোগসাজসে খাসজমির ভুয়া বন্দোবস্তি প্রদান ও পাহাড়ীদের বন্দোবস্তকৃত ও নামীয় জমি ভুয়া কবুলিয়ত তৈরীর মাধ্যমে বহিরাগতদেরকে বন্দোবস্তি দেয়ার ঘটনা আজকের নয়। যার ফলে ভূমিসংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে বর্তমানে সরকার হিমসিম খাচ্ছেন। কিন্তু কোন কালে এ রহস্যজনক ঘটনার মুখোস উন্মোচিত হয়নি। সম্প্রতি

খাগড়াছড়িতে দুর্নীতিদমন বিভাগ সরকারী খাস জমি নামে-বেনামে ভুয়া বন্দোবস্তি দেয়ার এক গোপন রহস্য উৎঘাটন করেছেন।

গত ৭ই জুন জেলার দুর্নীতিদমন বিভাগের ইন্সপেক্টর গোলাম মওলা সিদ্দিকী খাস-জমি ভূঁয়া বন্দোবস্তির মাধ্যমে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে খাগড়াছড়ি জেলার কানুনগোসহ ৪৩ জনের বিরুদ্ধে ২টি মামলার চার্জসীট দিয়েছেন। খাগড়াছড়ি থানার মামলা নম্বর ৪ ও ৫ তাং ৩০-১১-৯২ এর তদন্ত শেষে এই চার্জসীট দেয়া হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা ছিলেন রতন কুমার রায় ও রুস্তম আলী। জেলা সদরের পেড়াছড়া ইউনিয়নের ৪১টি ভূঁয়া হোল্ডিং নম্বর-এ ১৭২.৫০ একর সরকারী খাস-জমি জেলা প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই নামে-বেনামে বন্দোবস্তি দেয়া হয়েছে মাত্র ৪, ৮০, ৮১৮ টাকার বিনিময়ে। চার্জ-সীটে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে জেলা কানুনগো মোজাম্মেল হক ও চেইনম্যান মং-এ দু'জনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। উক্ত মামলার কয়েকটি ক্রমিক নম্বর হলো—নং ৩৭৯ (ডি)। ৮২-৮৩, ২০১ | ৮৪-৮৫, ২৩ | ৮৩-৮৪, ১২২ | ৮৩-৮৪ ইত্যাদি। চার্জসীটে অভিযুক্ত অন্যান্য কয়েকজন হলেন—মোহম্মদ উদ্দীন, পদ্ম কুমার ত্রিপুরা, বিশ্বজ্যোতি চাকমা, সিরাজুল ইসলাম, আবদুল হালিম, আবুল বাসার প্রমুখ।

ভূঁয়া বন্দোবস্তির উন্মোচিত এই রহস্যের জের ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য বে-দখলকৃত (বহিরাগতদের দ্বারা) ভূমির জটিলতার নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে জুম্মদের প্রকৃত মালিকদের স্ব-স্ব জমি ফেরত প্রদানের জন্য পার্বত্য জনগণ সদাশয় সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন।

যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হলে কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেয়া সম্পর্কে সেনা কর্তার হুমকি

বিলম্বে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ বিগত ৩১শে মার্চ '৯৫ ইং গুইমারা রিজিয়ন কম্যাণ্ডার কর্ণেল মোস্তাফিজুর রহমান স্থানীয় ইউ, পি, চেয়ারম্যান, মেম্বার, মৌজার হেডম্যান, কার্বারীসহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে সিন্দুকছড়িতে আর্মির কড়া প্রহরাধীনে এক জনসভা করেন। উক্ত সভায় উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন (১) নক্ষত্র নারায়ণ দেববর্মণ, সদস্য, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ, (২) কংজ্যরী মারমা ঐ এবং (৩) শের আলী ভূঁইয়া, চেয়ারম্যান পাতাছড়ি ইউ পি। বক্তারা সবাই বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাফাই গেয়ে শুনাইয়েছিলেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্থিতিশীল অবস্থার জন্য জনসংহতি সমিতিকেই দোষারোপ করে গালিগালাস করেন। রিজিয়ন কম্যাণ্ডার তার বক্তব্যে বলেন "তোমরা সতর্ক হয়ে যাও, ২০শে এপ্রিল '৯৫ ইং যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হতে যাচ্ছে।" যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে ঔষধ-পত্রাদিসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কড়া বিধি-নিষেধ আরোপ করা হবে ও চলাফেরায় রাস্তাঘাটে ঘন ঘন চেক পোষ্ট বসানো হবে এবং জুম্মদের চলাফেরায় কড়াকড়িভাবে চেক করা হবে বলে রিজিয়ন কমাণ্ডার সাহেব তার কড়া ভাষণে উল্লেখ করেন। তার এই কড়া বক্তব্যে সভায় উপস্থিত জুম্ম জনগণ তথা এলাকাবাসীগণ যথেষ্ট ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন বলে জানা গেছে।

জুম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির পাঁয়তারা

বিগত ৮ই এপ্রিল '৯৫ ইং বান্দারবান রিজিয়ন কম্যাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার মোয়াজ্জেম হোসেন বান্দারবান জেলাধীন বালাঘাটা হাইস্কুলে মাঠে তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়-দের নিয়ে এক তথাকথিত মহাসম্মেলনের আয়োজন করেন। উক্ত মহাসম্মেলনে রিজিয়ন কম্যাণ্ডার সাহেব বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যাকে সভাপতি বানিয়ে নিজেই প্রধান অতিথির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। প্রধান অতিথির ভাষণে রিজিয়ন কম্যাণ্ডার চাকমা বিদ্বেষী বিভিন্ন বক্তব্য

তুলে ধরে শান্ত প্রকৃতির তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের লোকজনদেরকে চাকমাদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে অপপ্রয়াস চালান বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। জুম্ম জনগণের বর্তমান আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে একমাত্র চাকমাদের আন্দোলন এবং এতে তঞ্চঙ্গ্যা ও অন্যান্য জুম্ম সম্প্রদায়ের কোন লাভ হবে না বলে রিজিয়ন কম্যাণ্ডার বুঝাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তথাকথিত মহাসম্মেলনে উপস্থিত তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের লোকজন রিজিয়ন কম্যাণ্ডারের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন এবং তার প্ররোচামূলক বক্তব্যে তাদের মধ্যে কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়নি বলে জানা যায়।

সেনাবাহিনী প্রতিরোধাত্মক মামলা, জুম্ম নির্যাতন অগ্নিসংযোগ

বিগত ১৬ই এপ্রিল '৯৫ ইং তারিখে উল্টাছড়ি গোলক্যাপাড়া আর্মি ক্যাম্প, ২৩ ই বি আর মহালছড়ি জোন এর মেজর মোঃ নাসির ও সুবেদার আকবরের নেতৃত্বে ২০ জন সেনা সদস্য প্রত্যন্ত মইন এলাকায় অপারেশনে যায়। এই অপারেশনে সেনা সদস্যরা নিরীহ জুম্মদেরকে নানাভাবে উত্যক্ত করতে থাকে। পরের দিন অর্থাৎ ১৭ই এপ্রিল শান্তিবাহিনীর এক সশস্ত্র দলের সম্মুখে পড়লে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে, এই সংঘর্ষে লান্স নায়েক মোঃ আকমল নামে এক সেনা সদস্য ঘটনাস্থলে নিহত ও অপর তিনজন গুরুতরভাবে জখম হয়। এরপর ১৮ই এপ্রিল মহালছড়ি জোনের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল মোঃ জাকির হোসেন প্রায় ২০০ সেনা সদস্যকে ৬টি গ্রুপে ভাগ করে ঐ এলাকায় সাধারণ জুম্মদেরকে হয়রানি শুরু করে। ২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত সেনাদের বিভিন্ন উৎপীড়নে এলাকাস্থ জুম্ম গ্রামবাসীরা বাড়ীঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই অপারেশনে গোলক্যাপাড়া ক্যাম্পের মেজর মোঃ নাসির ৭০/৪৫ জন সেনা জোয়ান নিয়ে ৫টি বাড়ী ভস্মীভূত করে দেয় ও আরো অনেককে মারধর করাসহ পাঁচ লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি ক্ষতিসাধন করে বলে জানা যায়। এই অপারেশনে সুবলকিষ্ট মইন আদামে (মহালছড়ি) (১) মিঃ চোখ্যা চাকমা (৩২), পিতা চিত্তরঞ্জন চাকমা, (২) মিঃ অমূল্যরঞ্জন চাকমা, পিতা জয়ন্ত কুমার চাকমা, (৩) মিঃ সুশীল জীবন চাকমা (২৮), পিতা ঐ, (৪) মিঃ রঞ্জিত চাকমা (২৮), পিতা গুণধর চাকমা, (৫) মিঃ জ্যোতি কুমার চাকমা (৪১), পিতা-নির্মল চাকমার বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করা হয় ও একই গ্রামের অন্যান্য যারা অত্যাচার-উৎপীড়নের শিকার হয়েছেন তাদের কয়েকজনের নাম— ১। মিঃ জ্ঞান রঞ্জন চাকমা (৩৫), পিতা—জয়ধর চাকমা, ২। মিঃ সাধন কুমার চাকমা (৪৬), পিতা-বীরেন্দ্র চাকমা ও আরো অনেকে। যুদ্ধবিরতির সময়েও সেনাবাহিনীর এ রকম গর্হিত কার্যকলাপে এলাকার জনসাধারণ বেশ উদ্বিগ্ন ও হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছে বলে জানা যায়।

জুম্ম নারী ধর্ষণের প্রচেষ্টা

বিগত ২রা মে'৯৫ ইং তারিখে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি থানাধীন বঙ্গলতলী মৌজার করেঙ্গাতলী গ্রামের এক জুম্ম যুবতীকে জনৈক মুসলিম বাঙ্গালী কর্তৃক ধর্ষণের প্রচেষ্টায় এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। ঘটনার দিন উক্ত গ্রামের মিস্ মঙ্গলরানী চাকমা, পিতা—মৃত নাগর চান চাকমা সকাল আনুমানিক সাড়ে ১০ ঘটিকার সময় করেঙ্গাতলী বাজার থেকে নিজবাড়ী ফেরার পথে এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থান থেকে বের হয়ে মোঃ সাইদুল ইসলাম তাকে ধর্ষণের জন্য পাশবিক প্রচেষ্টা চালাতে আরম্ভ করে। যুবতীটি ধৃত হওয়ার সাথে সাথে চীৎকার করে উঠলে নিকটস্থ লোকজন জড়ো হয়ে উক্ত সাইদুল ইসলামকে ধরে ফেলে ও ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য জনাব রশিদ আহম্মদের কাছে হস্তান্তর করে। এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য এলাকার জনগণ ও হিল

উইমেন ফেডারেশন এর সদস্যাবৃন্দ গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। হিল উইমেন ফেডারেশন এর বাঘাইছড়ি শাখা সম্পাদিকা ও সভানেত্রী যৌথভাবে ৬ই মে '৯৫ ইং তারিখে বাঘাইছড়ি থানা নির্বাহী অফিসারের নিকট বিচারের জন্য এক স্মারকলিপি পেশ করেন। উক্ত থানা নির্বাহী অফিসার উক্ত স্মারকলিপি গ্রহণ করলেও এখনো তার বিচারের কোন ব্যবস্থা হয়েছে বলে জানা যায়নি।

চাকমা সংস্কৃতিক গোষ্ঠীর শিবির পরিভ্রমণ

গত ২৬-২৮শে মে '৯৫ ইং তিনদিন ব্যাপী অল ইণ্ডিয়া চাকমা কালচারেল কনফারেন্স (এ, আই, সি, সি,) এর ১৮ সদস্যক এক প্রতিনিধিদল ত্রিপুরাস্থ জুম্ম শরণার্থী শিবিরে এক সাংস্কৃতিক সফরে যান। প্রতিনিধিদলের এই সফরের সময় শিবিরবাসী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী স্ব-স্ব-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের উপর নৃত্য ও সংগীত অনুষ্ঠান প্রতিনিধিদলকে প্রদর্শিত করেন ও শিবিরের করুন অবস্থা সম্পর্কে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন

শিবিরের অবস্থার প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও শিবিরবাসীদের পেশকৃত স্মারকলিপির ভিত্তিতে প্রতিনিধিদল ১লা জুন '৯৫ ইং তারিখে সংগঠনের সভাপতি শ্রীবিপিন চন্দ্র তালুকদার এর স্বাক্ষর সম্বলিত একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। উক্ত রিপোর্টে শিবিরে রেশন ঘাটতি ও সরবরাহে অনিয়ম, মেরামতের অভাবে শিবিরগুলির জরাজীর্ণতা, চিকিৎসা, পানীয় জল, শিক্ষা, প্রসুতি, মা ও শিশুদের পুষ্টিহীনতা প্রভৃতি সমস্যাদির কথা বিশদভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রিপোর্টে এসব সমস্যার যথা শীঘ্র সম্ভব সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশও করা হয়। রিপোর্টে আরো বলা হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুকূল রাজনৈতিক অবস্থা ফিরে না আসায় তাদেরকে স্বদেশ ফেরৎ পাঠালে ইতিপূর্বে সীমান্তবর্তী ত্রিপুরা ও মিজোরাম হতে ফিরে যাওয়া জুম্মদের মত জানমাল ও ধন সম্পত্তির নিরাপত্তা থাকবে না।

সর্বশেষে শরণার্থীরা যতদিন পর্যন্ত শিবিরে অবস্থান করে ততদিন পর্যন্ত যেন তাদেরকে শরণার্থীর মর্যাদা দেয়া হয় তার জন্য তারা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন জানান।

পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ অব্যাহত

সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যেকার অনুষ্ঠিত বৈঠক সমূহে পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতলবাসী মুসলমান বাঙ্গালীদের এনে আর বসতি দেয়া হবে না—সরকার এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকলেও অতি সম্প্রতি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাতে নতুন করে সমতল এলাকা হতে মুসলমান বাঙ্গালী এনে বসতি দেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। গত ২২শে মে '৯৫ ইং পানছড়ি থানাধীন লতিবান ইউনিয়নের উল্টাছড়ি মৌজাতে ৮২ এবং পূজগাং মুখের শনটিলা নামক স্থানে ৭৫টি অনুরূপ সমতলবাসী পরিবার এনে বসতি দেওয়ার কাজ সমাপ্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য যে, শনটিলায় নববসতিকারীদের জানমালের তথাকথিত নিরাপত্তা বিধানের পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে এতদিন একটি নূতন সেনা ক্যাম্প নির্মাণাধীন ছিল। ক্যাম্পের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হওয়ার পর বর্তমানে ৪১ বেঙ্গল, পানছড়ি জোনের একটি সেনা ইউনিটকে উক্ত ক্যাম্পে মোতায়েন করে উল্লেখিত ৭৫টি সমতলবাসী পরিবারকে তথায় বসতি দেয়া হলো। সরকারের এই রহস্যজনক অনুপ্রবেশ ঘটানোর বিষয়ে জুম্ম জনগণের মনে এই প্রশ্ন জাগরিত হয়েছে যে, যেক্ষেত্রে পূর্বে আনীত বহিরাগতদের দ্বারা বেদখলকৃত জুম্মদের ভূমি সম্পর্কিত বিষয়াদি নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণে ভারত থেকে প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের অনেকেই নিজ নিজ জমিজমা ফেরৎ পাচ্ছেন না ও নিজ নিজ বাস্তুভিটায় যেতে পারছেন না, সেক্ষেত্রে এ নতুন অনুপ্রবেশ জুম্ম শরণার্থী সমস্যা তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে চরম অসদিচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ নয় কি?

সমীরণ বাবুকে ধাওয়া ও গাড়ী ভাংচুর

গত ২০শে মে '৯৫ ইং পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি শাখা কর্তৃক সংগঠনের ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপনের কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। এদিন সকাল অনুমানিক ৭-৩০ মিঃ হতে ৮-০০ মিঃ এর মধ্যে সংগঠনের প্রায় ছয়শত ছাত্রছাত্রী **মিছিল** সহকারে সমাবেশস্থল খাগড়াছড়ি টাউন হলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এ সময় গণধিকৃত খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ এর চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান তার অফিসের গাড়ীতে করে অফিস অভিমুখে যাওয়ার পথে ছাত্র মিছিলের সম্মুখে পড়লে ছাত্ররা বিক্রুপাত্মক ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে গাড়ী থামাতে বলে। কিন্তু দেওয়ান গাড়ী থামাতে না চাইলে মিছিলের একটা অংশ পথরোধ করে বসে। গোবেচারা দেওয়ান অবস্থা বেগতিক দেখে গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে পলায়নপর অবস্থায় দৌড়তে থাকেন। ছাত্ররা ইট-পাটকেল ছুড়তে ছুড়তে পিছু ধাওয়া করতে থাকলে দেওয়ান বাবু কোনমতে কলেজের অফিস কক্ষে আশ্রয় নিতে সক্ষম হন বলে জানা যায়। তবে ইতিমধ্যে তার গাড়ীটি ভাংচুর করে দেওয়া হয়।

"পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম একটি উপজাতি অঞ্চল বিধায় উক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তার জন্য উক্ত অঞ্চল একটি উপজাতীয় স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হইবে।"

—এম এন লারমা

"পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে আমরা দশটি ছোট ছোট জাতি বাস করি। চাকমা, মগ (মারমা), ত্রিপুরী, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, রিয়াং, মুরুং ও চাক এই দশটি ছোট ছোট জাতি সবাই মিলে আমরা নিজেদেরকে পাহাড়ী বা 'জুম্ম' বলি।"

—এম এন লারমা

"যে যত আদর্শবান সে তত ক্ষমাশীল, ত্যাগী, সাহসী, বিপ্লবী দূরদর্শী হতে পারে।"

—এম এন লারমা

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও প্রচারনা : তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।